শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা   মে ২০০৯   বিনিময়: ১ টাকা

ঐতিহাসিক মে দিবস জিন্দাবাদ

ইউ.পি.এ. - এন.ডি.এ. - তৃতীয় শক্তি নয়

গড়তে হবে নীতিভিত্তিক লড়াইয়ের রাজনৈতিক জোট

কুশল দেবনাথ

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন। দেশের ৫৪৩টি কেন্দ্রের জন্য প্রায় ৭০ কোটি ভোটার। এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয়ভাবে শাসকদলের তিনটি জোট গড়ে উঠেছে। কংগ্রেস পরিচালনাধীন জোট, বিজেপি পরিচালনাধীন জোট এবং সি.পি.আই(এম) দলের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'তৃতীয়' শক্তি বা নিজেটি। এদেশে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করতে শাসকশ্রেণীর যে তিনটি দল সবচেয়ে সক্রিয় সেই কংগ্রেস, বি.জে.পি. ও সি.পি.আই (এম) দলের নেতৃত্বেই এই জোট গড়ে উঠেছে। ১৯৯১ সালে নরসীমা রাও মনমোহন সিং -এর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল যখন নয়া অর্থনৈতিক নীতি লাগু করে তখন ভারতীয় জনতা দল এর বিরোধিতা করে। কিন্তু বিজেপি পরিচালিত এন.ডি.এ. জোট অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসার পর ঐ একই নীতি আরো জোরের সাথে বাস্তবায়িত করে। ২০০৪ সালে সি.পি.আই. (এম) সহ বিভিন্ন 'বামপন্থী' দলের সহযোগিতায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ. জোট ক্ষমতায় ছিল। গত বছরে আমরা দেখেছি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে আরো বীভৎসতায় ও নির্মমতায় এদেশে লাগু করা হয়েছে। দেশের জনসমষ্টির বিভিন্ন বিন্যাস এবং ক্ষমতার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতায় আছে তারাও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। উড়িষ্যার বিজু জনতাদল, মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি, মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি, শরদ পাওয়ারের এন.সি.পি. প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এরা একদিকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ভাগীদারির জন্য কেন্দ্রীয় কোন একটি প্রক্রিয়ার সাথে থেকেছে অপর দিকে নিজ রাজ্যে নির্মমভাবে বিশ্বায়নী নীতিকে বাস্তবায়িত করেছে। উড়িষ্যার বিপুল খনিজ সম্পদ ও কৃষিজমি নবীন পট্টনায়েক যখন বহুজাতিক সংস্থার কাছে বেচে দেয় তখন এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ২০০৪ থেকে ২০০৯ এই ৫ বছরে আমরা কী দেখেছি? এই সময়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন সংসদে গৃহীত হয়েছে। যে আইনের বলে বলীয়ান হয়ে শিল্পায়ন উন্নয়নের নামে জোর জবরদস্তি করে জল, জঙ্গল, জমি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে। জমি থেকে উৎখাত হয়েছে কৃষক, বর্গাদার, খেতমজুর, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষজনেরা। বড় বাঁধ, হাইওয়ে নির্মান, মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং, শপিং কমপ্লেক্স, রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ার নামে

চলেছে অবাধ কৃষিজমি উচ্ছেদ কর্মসূচী। বেসরকারী বন্দর তৈরীর নামে চলেছে মৎসীজীবিদেরও উচ্ছেদ। দেশের বহু মূল্যের খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের জন্য দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী উচ্ছেদ অভিযান জোরদার করেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা সর্বত্র এই চিত্র দেখা গেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে ইউ.পি.এ. সরকার যেমন এই জনবিরোধী কার্যক্রমকে লাগু করেছে আবার গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতায় আসীন বি.জে.পি.-সি.পি.আই. (এম) এবং বিজেডি সবাই একই পথ অনুসরণ করেছে। এই পর্যায়ে দেশব্যাপী এই উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন দেশজুড়ে সংগঠিত হয়েছে। রায়গড়-পস্কো-নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর-কলিঙ্গনগরের সংগ্রাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। নানা মতাদর্শে ভাবনায় বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও এই লড়াইগুলি গোটা সমাজে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছে। ২০০৬ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় কৃষিনীতি। বিগত কয়েক দশকে কৃষিতে বহুজাতিক কর্পোরেশন ও দেশিয় কর্পোরেট পুঁজি যে আধিপত্য বিস্তার করেছে এই কৃষিনীতি তাকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে এই আইনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের বিপুল পরিমানে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হবে। ভারত-মার্কিন পারমানবিক চুক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পনের এক ঘৃন্য নজির সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক বছরে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা কমেছে। অপরদিকে অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ী এর বেশীর ভাগ অসংগঠিত শ্রমিক দৈনিক ২০-৩০ টাকার কাজ করতে বাধ্য হয়। খুব সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে দেশে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দমন আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। এককথায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নী প্রক্রিয়া এদেশে জনগনের গলায় ভয়ংকর ভাবে চেপে বসেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো শুধু কংগ্রেস-বিজেপি-সি.পি.আই(এম) নয় বিভিন্ন আঞ্চলিক দল, ছোট দলগুলিও বিশ্বায়নী প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করতে অসম্ভব তৎপরতা দেখিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ, দেশি বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতি-বড়ো জমির মালিক ক্ষমতায় থাকা অন্যান্য বিভিন্ন শক্তি নিশ্চিত এই ভেবে যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে যে দলই ক্ষমতায়

শেষাংশ ৩ পৃষ্ঠায়

বন্ধ কারখানার জমিতে শিল্প

সি.পি.আই (এম)-এর মিথ্যাচার

এ রাজ্যে উর্বর কৃষিজমি বলপূর্বক দখলের প্রতিবাদের সময় রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী বলেছিলেন শিল্প কোথায় হবে? আকাশে? তখন এর উত্তরে অনেকেই বলেছিলেন বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন শিল্প গড়ার কথা। জবাবে শিল্পমন্ত্রী বলেছিলেন যে সম্ভব নয় কারন আইনগত জটিলতা আছে। বন্ধ কারখানার জমিতে অন্য কিছু হচ্ছে না? হ্যাঁ হচ্ছে? হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, সি.পি.আই.(এম) দলের মন্ত্রী ও নেতারা যেহেতু এই ব্যবসায়ে যুক্ত। আমরা দেখব কিভাবে বহু বন্ধ কারখানার জমিতে আবাসন ও শপিং মল গড়ে উঠেছে। না কোন নতুন শিল্প হয়নি। স্থানাভাবে কিছু নমুনা মাত্র প্রকাশ করা হলো।

(১) এক সময়ের বিখ্যাত উষা কারখানা - এখন সাউথসিটির আবাসন ও শপিং মল।
(২) খড়দহের বঙ্গোদয় কটন মিল - এখন আবাসন।
(৩) বরানগরের দীপ্তি হ্যারিকেন - গগনচুম্বী ইমারত।
(৪) বেলঘরিয়ার শেখর আয়রন - আবাসন।
(৫) ভারত উলেন - বিশাল আবাসন।
(৬) হাওড়ায় বেঙ্গল জুট মিল - গগনচুম্বী আবাসন।
(৭) হাওড়া গ্যাঞ্জেস রোপ - আবাসন।
(৮) যাদবপুরের অন্নপূর্ণা গ্লাস- আবাসন।

উদাহরণ বাড়াচ্ছি না। সি.পি.আই.(এম) এর নেতা, মন্ত্রী ও প্রমোটাররা আঁতাত করে এই কাজ করছে। এখানে সরকার আইনের যুক্তি দেখাচ্ছে না। উল্টে শিল্পের জন্য নির্ধারিত ফাঁকা জমিতেও 'নগরায়ণ'-এর জন্য আইন বদলানো হয়েছে। 'শিল্পায়নের' ঢাকের কিন্তু কমতি নেই!

আমাদের দেশ!

কাজ হারাচ্ছে মানুষ

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের দেশে কাজ হারাবেন ১ কোটি মানুষ। বিশ্ব-জোড়া আর্থিক মন্দার ধাক্কায় আমাদের দেশে ঘনিয়ে আসবে এই সঙ্কট বলে বণিকসভা অ্যাসোচেমের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্টে জানানো হয়েছে। আরেকটি সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে তার থেকেও ভয়ঙ্কর তথ্য। তাতে জানা গেছে ২০২০ সাল নাগাদ ৩০ শতাংশ পৌঁছে যাবে আমাদের দেশের বেকারির হার। আর মাত্র ১১ বছর পরে ২১ কোটির বেশি বেকার, কর্মহীন মানুষের দেশ হবে আমাদের ভারত।

বিশ্ব মন্দার প্রভাবে বিগত কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারিয়েছেন ১৫ লক্ষের বেশি মানুষ। আমাদের দেশের অলঙ্কার শিল্পে ৫ লক্ষের বেশি মানুষের কাজ চলে গেছে। শুধুমাত্র গুজরাটের অলঙ্কার শিল্পে সঙ্গে যুক্ত ১ লক্ষের বেশি শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। ভারতে সূর্যোদয়ের শিল্প যাকে বলা হচ্ছে সেই তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ৫০ হাজারের বেশি কর্মচারী কাজ হারাবেন বলেও বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। চলতি বছরের কয়েক মাসের মধ্যে দেশের বি পি ও শিল্পে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মী কাজ হারাবেন বলে এক সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন বিজনেস প্রসেস ইনডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (বি পি আই এ আই)-র প্রাক্তন সভাপতি সমীর চোপড়া। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা সংগঠিত শিল্পের থেকে আরো বেশি। বিশেষ করে মাইগ্রেন্ট শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ।

বাড়ছে জিনিসের দাম

পণ্য	২০০৪-এ মূল্য	২০০৮-এ মূল্য	মূল্যবৃদ্ধি শতাংশে
চাল	কেজি প্রতি ১৩ টাকা	কেজি প্রতি ১৯ টাকা	৪৬.১৫
গম	কেজি প্রতি ৮ টাকা	কেজি প্রতি ১৩ টাকা	৬২.৫
আটা	কেজি প্রতি ৯ টাকা	কেজি প্রতি ১৪ টাকা	৫৫.৫৫
চানা	কেজি প্রতি ২৩ টাকা	কেজি প্রতি ৩৪ টাকা	৪৭.৮২
সরষের তেল	লিটার প্রতি ৫৪ টাকা	লিটার প্রতি ৭৭ টাকা	৪২.৫৯
দুধ	লিটার প্রতি ১৫ টাকা	লিটার প্রতি ২০ টাকা	৩৩.৩৩
চা	কেজি প্রতি ১০৫ টাকা	কেজি প্রতি ১১৮ টাকা	১২.৩৮
পেট্রোল	লিটার প্রতি ৩৩.৭ টাকা	লিটার প্রতি ৫০ টাকা+	৫+
ডিজেল	লিটার প্রতি ২১.৭ টাকা	লিটার প্রতি ৩৪ টাকা+	৬০+
রান্নার গ্যাস	সিলিন্ডার প্রতি ২৪১.৪৯ টাকা	সিলিন্ডার প্রতি ৩০০ টাকা+	৫৮+
নুন	কেজি প্রতি ৭ টাকা	কেজি প্রতি ১০ টাকা	৪২.৮৫

মরছে মানুষ

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সরকারি হিসেবে (ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো) ভারতে মোট ১,৮২৯৩৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন, অর্থাৎ প্রতি আধ ঘন্টা একজন।

বদলাচ্ছে কৃষি অর্থনীতি

'রাজ্য তথা দেশের কৃষি অর্থনীতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটছে তিনটি ক্ষেত্রেঃ (১) কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতি সংস্থাগুলি ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ছে। (২) ফসলের বৈচিত্র আনার নামে এমন চাষের কথা বলা হচ্ছে যেগুলি প্রক্রিয়াকরণের পর বিদেশে রপ্তানি করা হবে। (৩) কৃষক ও বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে চুক্তিচাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থার এই পরিবর্তন ঘটছে আমেরিকার ম্যাকিনসে এন্ড কোম্পানির শলাপরামর্শে। ওরা গোটা পশ্চিমবাংলাকে চারটে অঞ্চল ভাগ করে নিয়েছে। এক নম্বরে থাকছে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর। এখানে উৎপন্ন হবে মূলত চাল-তাও মোটা চাল নয় হবে রপ্তানীযোগ্য লম্বা দানার সরু চাল বা বাসমতীর মত সুগন্ধিচাল। এছাড়া এই অঞ্চলে আলু এবং বিশেষ ধরণের মোটা খোসার দীর্ঘস্থায়ী টমোটো, শসা ইত্যাদি ফলানো হবে। তাও সেটা রোজকার ঘরে খাওয়ার আলু হবে এমনটা নয় শুধু, পটেটো চিপসের জন্যে বিশেষ প্রযুক্তিজাত

সামগ্রিক কর্মসংস্থান ২০০২-২০০৫

	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫ (অস্থায়ী)
মোট কর্মসংস্থান	৮,৯০,৯৪৫	৯,০০,০৭২	৯,১১,৭৮০	৯,২০,৪০৮
'০৫ সালে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে				৭৭৭২
'০৫ সালে পুরোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে				৮৫৬
মোট কর্মসংস্থান				৮৬২৮

সূত্র- লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ২০০৫

যেখানে এক বছরে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ প্রায় ৮৬২৮ জন অথচ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছরে লক্ষাধিক নতুন কর্মপ্রার্থী কর্মসংস্থানের গালগপ্পো আর কতদিন শোনাবে সি.পি.আই. (এম) দল!

শেষাংশ ২ পৃষ্ঠায়

ভোট—তবু জারী আছে অন্য লড়াই

লালগড়ে পুলিশ বয়কট

পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লালগড়ের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি ওখানকার নির্বাচন করার ব্যাপারে কিছু ফয়সালা হলেও অবরুদ্ধ অঞ্চলে পুলিশ ঢুকতে না দেওয়ার ব্যাপারে ওখানকার জনগণ এখনো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি কলকাতায় এক বিশাল মিছিল করে ওখানকার আদিবাসী-মূলবাসী জনগণ তাদের দাবী হাজির করেন। ঐ সামগ্রিক অঞ্চলের ব্যাপক অনুন্নয়ন ও বঞ্চনার কথাও বারবার উঠে আসছে আন্দোলনে।

বৈদ্যবাটি পশুপতি ফ্যাক্টরি

হুগলীর বৈদ্যবাটির দিল্লী রোডের পশুপতি কারখানা গত দুবছর বন্ধ। এই কারখানার ৭০ জন স্থায়ী শ্রমিক ও শতাধিক ঠিকা শ্রমিক গত জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলিকে ছেড়ে দিয়ে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলে এবং আন্দোলনের পথে নামে। ফেব্রুয়ারী মাসে মালিকের বাড়িতে অভিযানের পর মার্চ মাসে মালিক বকেয়া মিটিয়ে দেয়। ২৬ এপ্রিল মালিক কারখানা অবৈধভাবে বন্ধ রাখার জন্য টাকা দিতে ও কারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ইনফোজেন

২৮ শে এপ্রিল ২৪ ঘন্টার গন-অনশনে সামিল হলেন সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের ইনফোজেনের কর্মীরা। দীর্ঘ তিন মাসের বেতন বকেয়া রাখার পর গত জানুয়ারী মাসে মালিক কোম্পানী অবৈধভাবে বন্ধ করে দেয়। এখানে চাকরি দেওয়ার জন্য প্রত্যেকের থেকে ৫০০০০ টাকা ও দু বছরের বন্ডও সই করানো হয়েছিল। শ্রমিকরা 'এ.এন.আই ইনফোজেন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' গঠন করে কোম্পানী খোলার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের দাবীতে তাদের লড়াই চালাচ্ছেন।

টিটাগড় লুমটেক্স জুট মিল

গত ২২শে এপ্রিল থেকে টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিল (মাঠকল)-এ মিথ্যে অজুহাতে ২৪ জন সাসপেন্ড শ্রমিককে কাজে ফেরানোর দাবীতে লাগাতার অনশন চলছে মিল গেটে। অনশনে বসেছেন সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের সদস্য সুনীল পাল এবং কারখানার দুই সাসপেন্ড শ্রমিক পীর মহম্মদ এবং হায়দার আলি। ভোটের মুখে মালিকী হামলার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এই ন্যায্য লড়াই এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কল্যাণী পেপার মিল

গত ১৮ এপ্রিল কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের প্যাপিরাস পেপার মিলের প্রায় ১৫০-২০০ শ্রমিক মিলের গেটে এক সারাদিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন। বিশ বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাটি তৈরীর সময় জমি দিয়েছিল এই শ্রমিকদের পরিবারগুলো। আজকাল শোনা যাচ্ছে, এখানে একটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হবে। যাই হোক না কেন, বেকার শ্রমিকদের পরিবারের ন্যূনতম একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবি ওঠে এই অবস্থানে।

মুলুকে শহীদ স্মরণ

১৯৮৭ সালে বীরভূমের বোলপুরের অদূরে মুলুক গ্রামে সিপিএমের ঘাতকবাহিনী মিছিল করে গিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে চার জন বিপ্লবী কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করে। এতদিন বাদে কোর্ট সেই গণহত্যার জন্য সিপিএমের ৪৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেয়। এই গণহত্যাকে ধিক্কার জানিয়ে এবং বিপ্লবী সংগ্রামকে তীব্রতর করার আহ্বান রেখে গত ২১ শে এপ্রিল মুলুকে শহীদ স্মরণে সামিল হয় সংগ্রামী বামপন্থী দলগুলি।

আমাদের দেশ !

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আলু যা সটান ঢুকে যাবে পেপসির মত কারখানার ঘরে। অর্থাৎ যে জমিগুলোতে গরিবের ফসল ফলতো, সেই জমিগুলি এখন ব্যবহৃত হবে বিত্তশালীদের চাহিদা মেটানোর জন্যে। এই অঞ্চলে তাই মোট ১৪ শতাংশ জমিকে ধানচাষের আওতামুক্ত করতে চাইছে ওরা।'

(সূত্র কৃষিক্ষেত্রে একচেটিয়া আগ্রাসন; - একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ)

ভারতে বিদেশী ঋণ ২০০২-২০০৮ (বিলিয়ন ডলার একক)

সাল (এপ্রিল-মার্চ)	মোট বিদেশী ঋণ	বর্হিবাণিজ্যিক ধার	প্রবাসী ভারতীয়দের সঞ্চয়	স্বল্পকালীন ধার
২০০২	৯৮.৯০	২৩.৩০	১৭.১০	২.৭
২০০৩	১০৪.৯০	২২.৫০	২৩.১০	৪.৭
২০০৪	১১১.৬০	২২.০০	৩১.২০	৪.৪
২০০৫	১৩২.৯০	২৬.৪০	৩২.৭০	১৭.৭
২০০৬	১৩৮.১০	৩৬.৪০	৩৬.৩০	১৯.৬
২০০৭	১৬৯.৬০	৪১.৭০	৪১.২০	২৬.২
২০০৮ (সেপ্টেম্বর)	১৯০.৫০	৫১.৮০	৪৩.৬০	৩০.৮

(সূত্র ইকনমিক সার্ভে, ২০০৮)

বিনয় কোঙারের ভাষায় কর্ম সংস্থান!

বিভিন্ন জায়গায় যে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে তা উল্লেখ করতে গিয়ে বিনয় কোঙার লিখেছেন, "দু'জন দারোয়ান লাগবে। জলের পাম্প চালাবার লোক লাগবে, হাউসিং এলাকাকে পরিচ্ছন্ন করার লোক লাগবে, গড়ে দৈনিক টুকিটাকি ইলেকট্রিক কাজ-কাঠের কাজ-মেরামতি-প্লাম্বিং-এর কাজের জন্য কয়েকজন নিয়মিত লোক লাগবে। এই কাজের মজুরিও বেশি। আজকাল ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া, গ্যাসের অর্ডার দেওয়া, ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া— এসব ব্যাপারেও পরিষেবা ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে,তাতে কিছু লোক লাগবে। কয়েকজন সব্জি ব্যাচারও কাজ পাবে। খুচরো দোকান গড়ে উঠবে। এছাড়া এদের বেশিরভাগ বাড়িতে কাজের লোক লাগবে। (সূত্র কৃষক দরদীদের মরা কান্না) অর্থাৎ পরিচারিকার কাজ, ঠিকা ভিত্তিতে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেচে থাকার জন্য যা কিছু কাজ, তা সবই নাকি কর্মসংস্থান!

কমছে মজুরী

অসংগঠিত শিল্পে এদেশে শ্রমিক প্রায় ৪০ কোটি। এদের শতকরা ৭০ শতাংশের মজুরি ২০ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। (অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট)

চা শিল্পের শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৫৩-৯০ টাকা। যা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে অনেক কম।

শ্রমিকদের গড় বেতনহার সারা দেশে

জুন-২০০৬ এ গ্রামীণ ভারতে অকৃষি পেশায় গড় দৈনিক বেতনহার (পুরষ শ্রমিকের)

	ছুতোর	কামার	মুচি	রাজমিস্ত্রি	ট্রাক্টর চালক	ঝাড়ুদার	অদক্ষ শ্রমিক
পশ্চিমবঙ্গ	৯৫.৮৩	৬০.০৬	৫৩.৮৪	১০০.১৯	১০৯.৯৫	(রিপোর্ট করেনি)	৫৬.৬৫
জাতীয় গড়	১১৮.০১	৯১.৪৬	৬৮.৫৭	১২৭.৭৪	৮৭.৩৬	৫২.১৬	৬৪.০১

(সূত্র লেবার ব্যুরো, ২০০৬)

জুট শিল্পের বর্তমান শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার। এদের মধ্যে ১ লাখ ৪০ হাজারের বেশী শ্রমিক দৈনিক ৪০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়। (নিজস্ব সমীক্ষা)

এরাজ্যে যেকটা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে। সেখানে যে শিল্পগুলি আছে তাতে শ্রমিকদের গড় বেতন ১০০ টাকা। আর কাজের সময়সীমা অবশ্যই ন্যূনতম ১২ ঘন্টা। (নিজস্ব সমীক্ষা)

নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলি মসনদে যেতে মরিয়া

প্রদীপ রায়

সংসদীয় রাজনীতির জগতে আদর্শগত রাজনীতির গুরুত্ব যে বিশেষ নেই তা এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির জোট গঠনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে ভালই বোঝা যায়। জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সর্বভারতীয় দল হিসাবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবার সাথে সাথে এদেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়াকে পুঁজি করে সংসদীয় রাজনীতিতে উঠে এসে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলিও এখন সুবিধাবাদের পাঁকে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করার আগ্রাসী মনোভাব থেকেই এরা নানা অনৈতিক জোট বা বোঝাপড়া গড়ে তুলছে। জাতীয় দলগুলির সাথে আঞ্চলিক দলগুলি আজ একটি বিষয়ে একমত। তা হোল— উদার অর্থনীতি তথা বিশ্বায়নের পথে ভারতবর্ষকে এক সম্প্রসারণবাদী মার্কিন তাবেদারী রাষ্ট্রে পরিণত করা। সে যাই হোক, নবম লোকসভা ভোট যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ভোটমুখী জোটের চালচিত্রটাই বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

গতবারের লোকসভা ভোটে এদেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানত দুটি জোটে ভাগ হয়েছিল। একদিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ. জোট আর অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ. জোট। এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপি ও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দুটি জোট থাকলেও বহু আঞ্চলিক দল এই দুটি জোটের বাইরে নানা সমঝোতা-বোঝাপড়া গড়ে তুলেছে। গত ১২ই মার্চ কর্নাটকের টুমকুর-এ জনতা দল এস্ (দেবগৌড়া নেতৃত্বাধীন), তেলেগু দেশম্ পার্টি (চন্দ্রবাবু নাইডু নেতৃত্বাধীন), তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (চন্দ্রশেখর রাও নেতৃত্বাধীন), জনহিত কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম প্রভৃতি বিভিন্ন দলের নেতারা এক সমাবেশে একত্রিত হয়ে এক অ-কংগ্রেসী ও অ-বিজেপি জোট— তৃতীয় ফ্রন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। বলা হয়, তৃতীয় ফ্রন্ট গরিবগুর্বোদের জন্য কাজ করবে। প্রকাশ কারাত, এ.বি. বর্দ্ধনরা আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এই সমাবেশে জয়ললিতা (এআইএডিএমকে) ও মায়াবতী (বহুজন সমাজ পার্টি)-কে হাজির করার। কিন্তু তাঁরা সমাবেশে প্রতিনিধি পাঠিয়েই দূরত্ব বজায় রাখে। কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বা রাজনৈতিক বক্তব্য ব্যতিরেকে কেবল ক্ষমতার একটি তৃতীয় সর্বভারতীয় আধার গড়ে তোলাই এই জোটের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। এর পরবর্তীতে গত ৩রা এপ্রিল উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে এক যৌথ সমাবেশে হাজির হন নবীন পট্টনায়েক (বিজেডি), প্রকাশ কারাত, এ.বি. বর্দ্ধন ও এনসিপি দলের নেতারা। উদ্দেশ্য একটাই অ-কংগ্রেসী ও অ-বিজেপি ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তোলা। দীর্ঘ এগারো বছর বিজেপির সাথে সরকারে সদ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা নবীন পট্টনায়েকরা নতুন কোন রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে এমন নয়। পরে নবীন পট্টনায়েক ঘোষণা করেছেন যে তাঁদের বোঝাপড়া উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর শরদ পাওয়ারের এনসিপি কংগ্রেসের উপর চাপ বাড়াতেই যে আগ্রহী, কোন নতুন জোট গঠন নয় তা পরিষ্কার হয়ে যায় এনসিপি-কংগ্রেস-এর আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস জোটের শরিক লালুপ্রসাদ যাদব (আর জে ডি), মুলায়ম সিং যাদব (সমাজবাদী পার্টি) ও রামবিলাস পাসোয়ান (এল জে পি) একত্রিত হয়ে আরও একটি জোট (চতুর্থ ফ্রন্ট?) গঠন করে। ঘোষণা করা হয় যে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটে থাকলেও আগ্রাসী কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁরা তিনটি স্তম্ভ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। অর্থাৎ জোটের ভিতর আর একটি জোট গড়ে তারা দর কষাকষির পাল্লা ভারি করতে চাইছে। এখানেও বিকল্প কোন রাজনৈতিক বক্তব্য অনুপস্থিত। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা তাদের জোটসঙ্গী বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টি করতে শরদ পাওয়ারের সাথে কৃত্রিম ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে যা শরদ পাওয়ারেরও ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। এবং শেষ পর্যন্ত বিজেপি শিবসেনাকে সন্তুষ্ট করে আসন সমঝোতা পাকা করে। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (শিবু সোরেন গোষ্ঠী) বার বার কংগ্রেসের কাছে নাকানি চোবানি খেয়েও কংগ্রেসের সাথেই আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আদিবাসী জনসাধারণের মুক্তির প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিকই থেকে যায়। আর এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভায় আসন বাড়াতে তার কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে। এই রাজ্যে সাম্প্রতিক আন্দোলন-এর বিষয়গুলি (জমি অধিগ্রহণ, সেজ গঠন, রেশনে দুর্নীতি, আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ প্রভৃতি) সম্পর্কে কোন বোঝাপড়া সমঝোতা ব্যতিরেকেই আসন সমঝোতা হয়ে যায়। আঞ্চলিক দলগুলির দেউলিয়াপনার বিবরণ এইভাবে দিতে গেলে তালিকা যে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে, তা বলাই বাহুল্য।

কোন সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক বা জাতীয় ইস্যু বা সাধারণ মানুষের স্বার্থে রচিত কোন নীতিগত অবস্থান যে এই আঞ্চলিক দলগুলিকে পরিচালিত করে না তা এদের গোটা কর্মকাণ্ডে স্পষ্ট। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে এই দলগুলি তাদের ঘোষণাপত্রে প্রাদেশিকতার ছোঁয়া রাখছে। আর ভোট গ্রহণের আগে এই আঞ্চলিক দলগুলি যে যেখানে দাঁড়িয়ে তাদের অবস্থান ভোটের পরে কোথায় হবে তা দলগুলির নেতানেত্রীরাও বলতে অক্ষম। ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশ করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে এই দলগুলির লজ্জাবোধও লুপ্তপ্রায়। ফলে ভোটের ফলাফলের উপর নির্ভর করে এক চূড়ান্ত সুবিধাবাদী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য কম-বেশি সবকটি রাজনৈতিক দলই প্রস্তুত। এম.পি. কেনাবেচার এক নোংরা খেলা দেখতে আমাদের মানসিকভাবে তৈরি থাকা দরকার। কুমারী জয়ললিতা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যে কোন বিকল্প রাস্তা গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত (অর্থাৎ ১৮০° ডিগবাজি খেতে?)। এন সি পি নেতা বলেছেন, তিনি চান একজন মারাঠা প্রধানমন্ত্রী (অর্থাৎ ঠারেঠোরে নিজের কথাই বলছেন!)। উড়িষ্যাতে বামেদের সাথে জোট গড়লেও শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি বিজেপি জোট ছাড়েননি (পিছনের দুয়ার খুলে রাখার মতলব!)। আর মায়াবতীর লোকেরা তো একজন দলিত প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন আম জনতার মাঝে প্রচার ফেরি করে চলেছে (যদি কোন সুযোগ মিলে যায় তো মায়াবতী প্রস্তুত!)। লালু-মুলায়ম-পাসোয়ান রাও বড় দাও মারতে আগে ভাগেই তৈরি। এরাজ্যে কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে মন্ত্রীত্বের টোপ ঝুলিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। তাই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম রিজওয়ানুর-লালগড়ের কাঁধে ভর করে মমতারাও মন্ত্রী হওয়ার আশায় উল্লসিত। তবে সবচাইতে অবাক করছে কারাত-বর্দ্ধনদের বামদলগুলি। যে পরমাণু চুক্তির বিরোধীতা করে তাদের কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ, যাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন সেই জাতীয় কংগ্রেসকে সরকার গঠন করার প্রশ্নে প্রয়োজনে সমর্থনের সম্ভাবনা নাকি তাঁরা বাতিল করে দিচ্ছেন না। দেউলিয়া রাজনীতির উদাহরণ এর চাইতে ভালো আর কি-ই বা হতে পারে। অবশ্য ভোট সর্বস্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে এসব কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

দেশজোড়া অনাহার-আত্মহত্যা-বেকারী-অপুষ্টি-অশিক্ষা-মূল্যবৃদ্ধি, জল-জমি-জঙ্গল ও খনিজ সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, পরিবেশ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের দাঙ্গা, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন প্রভৃতি অসংখ্য জ্বলন্ত সমস্যার দিকে তাকানোর সময় এই নেতাদের নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-যন্ত্রণা-সংগ্রামকে কাজে লাগিয়ে এম.পি. মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নেই তাঁরা বিভোর। তাই পরমাণু চুক্তি, সেজ গঠনের নামে এদেশের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার ঘটনাকে সমর্থন জানিয়েও এই দলগুলি ক্ষমতায় যেতে প্রস্তুত। ভারতে বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষের সংগ্রাম-আশা-আকাঙ্ক্ষা তেকে উঠে আসা আঞ্চলিক দলগুলি আজ শাসকবর্গের সেবায় নিয়োজিত এবং জাতীয় দলগুলির সাথে দৃঢ়ভাবে জোটবদ্ধ। এই মোহমুক্তির পথ ধরেই জনসাধারণ তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করতে পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র-এর এটাই যে আসল চেহারা।

গড়তে হবে নীতিভিত্তিক লড়াইয়ের রাজনৈতিক জোট

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

আসুকনা কেন তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চোখ ফেরাব এরাজ্যের দিকে। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৩৫টি আসন দখল করে সি.পি.আই.(এম) ও তার সহযোগী দলগুলি। কেন্দ্রের ইউ.পি.এ. সরকার এদের সমর্থনেই ৪ বছর চলেছে। ১৯৭৭ সাল থেকে দীর্ঘ প্রক্রিয়া জুড়ে এরাজ্যে সংসদীয় রাজনীতিতে সি.পি.আই.(এম) সহ 'বাম' দলগুলির সংশয়াতীত প্রাধান্য ছিল। কিছু সংস্কার মূলক কাজ, সংগঠিত দল এবং স্বৈরাচার এই প্রাধান্যের ভিত্তি ছিল। এর উপর দাড়িয়ে এ রাজ্যের গণসংগ্রামকে স্তব্ধ করে দিতে তারা পারছিল। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রতিবাদী আন্দোলন মাঝে মধ্যে ফেটে পড়লেও তা রাজ্যব্যাপী রূপ পায়নি। কিন্তু এদেশের শাসকশ্রেণী শিল্পায়ন ও উন্নয়নের নামে যখন নতুন ভাবে কেন্দ্রীয় জনবিরোধী প্রক্রিয়া গ্রহণ করলো, এরাজ্যেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরিচালিত সরকার তাকে দ্রুততায় বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হলো। এখান থেকেই শুরু হলো একেবারে নীচুতলা থেকে প্রতিবাদের এক নতুন ধ্বনি। বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদী হলো সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াই। সিপিআই(এম) দল ও রাষ্ট্রের নৃশংস স্বৈরাচারীতার বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যে প্রতিবাদী আন্দোলন ভেঙ্গে দিল দীর্ঘদিনের জড়তাকে। গণ-আন্দোলন নতুন রূপে - নতুনভাবে এরাজ্যে ফেটে পড়লো। ভেঙ্গে গেলো অচলায়তন। এবং মানুষ প্রত্যক্ষ করলো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নী কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে কি বীভৎস, নারকীয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে সি.পি.আই.(এম) দল। নন্দীগ্রাম যার জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু সমস্যা হলো আন্দোলন যে বিষয় নিয়ে এরাজ্যের গণ-আন্দোলনের বন্ধ্যাত্ব কাটাতে সাহায্য করলো আন্দোলনের নেতৃত্বে সংগ্রামী বাম শক্তি না থাকার জন্য, উপরন্তু নেতৃত্বের রাশ তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে থাকার জন্য এই আন্দোলন সামাগ্রিকভাবে নীতি বদলের লড়াইতে পর্যবসিত হলোনা। সমস্ত লড়াই শেষ বিচারে শুধুমাত্র সি.পি.আই.(এম) বিরোধিতায় রূপ পেলো। এই পর্যায়ে প্রতিবাদী লড়াইতে বহু মানুষ সামিল হয়েছে রাজনৈতিক ভাবনায় যারা বামপন্থী অবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু একটি বিকল্প কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া না থাকার জন্য বা অত্যন্ত দুর্বলভাবে থাকার জন্য গোটা আন্দোলনের divident প্রধানভাবে পেলো তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা ব্যানার্জী। আর এই নির্বাচনে আমরা কি দেখছি, গত কয়েক বছরে যে নীতির জন্য দেশব্যাপী জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণ ও গরীব মানুষকে উচ্ছেদ করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেই নীতির রূপকার কংগ্রেসের সাথে শুধুমাত্র আসন বাড়ানোর সমঝোতা করলো তৃণমূল কংগ্রেস। ফলতঃ পিছনে চলে গেল গত কয়েক বছরের কংগ্রেসী শাসনের অপকর্ম। তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোট কি এ রাজ্যে স্বৈরাচারী সি.পি.আই.(এম) দলের বিকল্প হতে পারে? না পারেনা। পিছনে চলে গেলো নীতিগত কার্যক্রম। সামনে চলে এলো শুধুমাত্র ভোট ভাগাভাগীর বিষয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার অসততা দিয়ে অসততাকে আটকানো যায়না, সততা দিয়েই আটকাতে হয়। ঠিক তেমনি যে কারনে সমস্যা, যে নীতির ফলে সমস্যা তাকে সামনে না এনে, সেই নীতির রূপকারদের সাথে জোট বেঁধে আর যাই হোকনা কেন প্রকৃত প্রতিরোধ আন্দোলন হয়না। শুধু তাই নয় আন্দোলনের প্রতি বেইমানিও হয়। তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা ব্যানার্জী তাই করেছে। যে সেজ আইনের জন্য নন্দীগ্রামের লড়াই, বিপুল পরিমান মানুষের আত্মত্যাগ, সেই সেজ আইনের রূপকার কংগ্রেসের সাথে ভোটের জোট শেষ বিচারে মানুষের লড়াইকে প্রতারিত করা হয়। অনেকে বলেছেন এরাজ্যে সি.পি.আই.(এম) কে ঠেকাতে এছাড়া উপায়ই বা কি ছিল? যারা এই সমস্ত যুক্তি দেন হয়ত দীর্ঘ দিন ধরে সি.পি.আই.(এম) এর অপশাসন দেখতে দেখতে তারা যুক্তির বিন্যাস এইভাবে গড়ে তোলেন। আসলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সি.পি.আই.(এম) দলের স্বৈরাচারী আক্রমণ, রাষ্ট্রের নৃশংসতা দেখে তারা তাৎক্ষণিকতা থেকে এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। কিন্তু তারা ভেবে দেখেন না, গণ আন্দোলন কিন্তু জনগণের নিজস্ব শক্তির উপর দাঁড়িয়ে চলে। সেখানে সংসদীয় গরিষ্ঠতা প্রধানতঃ কোন নির্ধারক শক্তি হয়না। যদি তাই হতো তাহলে তো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের সেই দাম্ভিক উক্তি "আমরা ২৩৫ - ওরা ৩০" এই কথা সত্য বলে প্রমাণিত হতো। ২৩৫ এর জেরে ওরা নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের লড়াই ভেঙ্গে দিতে পারতো। পারেনি কারন বুদ্ধের যুক্তি ছিল শাসকদের যুক্তি। শাসকরা ঐ ভাবেই যুক্তি বিন্যাস করে। কিন্তু জনগন যেহেতু আন্দোলন করে নিজের সমস্যার উপর দাড়িয়ে, বাঁচার তাগিদে এবং নীতির বিরুদ্ধে। সেখানে বুদ্ধদেবের যুক্তি জনগনের আন্দোলনের কাছে পরাস্ত হয়। আন্দোলন জয়ী হয়। যারা আজকে সি.পি.আই(এম) কে ঠেকাতে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের পক্ষে দাঁড়ায় তারা কিন্তু ভুলভাবে হলেও বুদ্ধদেবের যুক্তিকে মেনে নেন। তারা ভাবেনা, যে নীতির জন্য এই ব্যাপক আক্রমণ, সেই নীতি বদলের লড়াই না করে উল্টে নীতির রূপকারদের (সনিয়া-মনমোহন-প্রণব) সাথে জোট করা আসলে আন্দোলনে মর্মবস্তুতে পিছনে থেকে ছুরি মারা হয়। মমতা ব্যানার্জী তার শক্তি, ভাব মূর্ত্তি বাড়াবার জন্য একটা সময়ের জন্য একটু 'বামপন্থী' অবস্থান নিয়েছিলেন, যখন দেখলেন তারা সেই কাজ অনেকটা হয়েছে তাই ভোটের মুখে কেন্দ্রে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকা গড়ার ডাক দিয়ে কংগ্রেসের হাত ধরলেন। এতো বাঘকে ঠেকাতে গিয়ে নেকড়েকে আহ্বান করা হলো। আর শাসক শ্রেণীর যে গোষ্ঠী বিগত জমি আন্দোলনের সময় মমতার ভূমিকা দেখে 'উদ্বিগ্ন' ছিলেন, 'ঘরের মেয়েকে ঘরে' ফিরতে দেখে তারা বড়ই আহ্লাদিত। তারাও কোমর কষে এই জোটের পক্ষে দাড়িয়েছে। এরাজ্যের আনন্দবাজার পত্রিকা তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ।

যে নীতিগুলির বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ধরে দেশব্যাপী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। গরীব মানুষ প্রতিবাদী হয়েছেন, রাষ্ট্র ও দলের নৃশংসতার শিকার হয়েছেন, জীবন দিয়েছেন সেই বিষয়গুলি এবারের নির্বাচনে প্রধান অ্যাজেন্ডায় নেই। আছে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ক্ষমতায় যে কোনভাবে কিভাবে যাওয়া যায় তার মরীয়া প্রয়াস। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তৃতীয় জোটের কথা। যে নবীন পট্টনায়েক ১১ বছর বিজেপির সাথে ঘর করেছে এই মুহূর্তে তারা সি.পি.আই(এম) দলের বন্ধু শক্তি। যে বিজেপি এরাজ্যে সিপিআই(এম) দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার সেই দলের নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটে সেই নীতিকে কার্যকরী করে তখন তাকে গেরুয়া অভিনন্দন দেয়। এই সময় প্রয়োজন ছিল শাসকদলের সামগ্রিক নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনকে জোট বদ্ধ করে দেশব্যাপী এক পাল্টা নীতি প্রণয়নের। সেই প্রক্রিয়া না থাকার জন্য এবং সেই প্রক্রিয়া সমাজে যারা উপস্থাপিত করতে পারে সেই সংগ্রামী বাম শক্তির দুর্বল উপস্থিতির জন্য শাসকদলগুলির এ্যাজেন্ডাই নির্বাচনে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। আর জনগণকে দিয়ে এই এ্যাজেন্ডার পক্ষেই ভোট করিয়ে নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় কমঃ লেনিনের কথা। রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থে কমঃ লেনিন লেখেন 'যে সব দেশে পার্লামেন্টারি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু আছে শুধু সেই সব দেশেই নয়, অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বুর্জোয়া পার্লামেন্ট তন্ত্রের সারমর্ম হইতেছে এই শাসকশ্রেণীর কোন সভ্য পার্লামেন্ট মারফৎ জনগণকে দমন ও নির্যাতন করিবে, কয়েক বছর অন্তর একবার করিয়া তাহা স্থির করা' (রাষ্ট্র ও বিপ্লব - পৃ ৪৬)। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কমঃ লেনিনের এই বক্তব্য আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

শাসকশ্রেণীর এই জোটগুলির বিরুদ্ধে এরাজ্য অন্ততঃ সংগ্রাম বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির একটা রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠা প্রয়োজন ছিল, যারা হয়ত এই মুহূর্তে নির্বাচনী লড়াইয়ে খুব একটা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হতোনা। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে রাজনীতিকে নিয়ে যাবার মাধ্যমে শাসকদের জোটের বিরুদ্ধে জনগণের সামনে একটা নতুন বিকল্প শক্তির সম্ভাবনা সামনে রাখতে পারতো। একটা নীতিভিত্তিক লড়াইয়ের কর্মসূচীর মাধ্যমে আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনকে নীতিবদলের লড়াইয়ে পরিণত করতে পারতো। কিন্তু সমস্যা হলো যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াইয়ের পর, বিভিন্ন দলগুলি তৎক্ষণিক লাভের জন্য এমন সব কান্ডকারখানা শুরু করলেন সেই সম্ভাবনা প্রায় নষ্টের মুখে এসে দাড়িয়েছে। যেমন ধরা যাক সি.পি.আই. (এম.এল.) লিবারেশনের কথা। যে সি.পি.আই. (এম) দল বিশ্বায়ন কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য নন্দীগ্রামে গণহত্যা সংগঠিত করে, কিছু আসন পাবার তাগিদে বিহারে সেই দলের সাথে রাজনৈতিক বোঝাপড়া করে। এইভাবে এরাজ্যে অন্ততঃ সংগ্রামী শক্তি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার ধরা যাক এস.ইউ.সি.র কথা। একথা স্বীকার করতেই হবে গত কয়েক বছরের বিভিন্ন বিষয়ে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী নেবার জন্য এস.ইউ.সি. দলের বিশ্বাসযোগ্যতা একভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? একটি এম.পি সিট জেতার জন্য তারা কংগ্রেস-তৃণমূলের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা গড়ে তুললো। এমনকি তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে ১ বছরের মধ্যে তারা দুরকম মূল্যায়ন করে ফেললেন। এস.ইউ.সি. দলের পক্ষ থেকে ১৩ই মার্চ '০৯ কেন্দ্রিয় কমিটির এক সিদ্ধান্ত রাজ্যবাসীকে জানানো হয়। ঐ সিদ্ধান্তে তারা বলেন "১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে নানা বিক্ষোভ আন্দোলন করে গিয়েছে।" আর এক জায়গায় তারা লিখেছেন "অন্যান্য রাজ্যেও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়তে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের স্বার্থবাহী কংগ্রেস, সি.পি.এম, বিজেপি মরীয়া হয়ে ষড়যন্ত্র করতে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসকে এস.ইউ.সি.আই থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই আন্দোলনের ঐক্যকে ভাঙা যায়।" একথা যদি এস.ইউ.সি.আই ধারাবাহিকভাবে বলে আসতো তবে সমস্যা কিছু ছিলনা। কিন্তু এস.ইউ.সি ২০০৭ সালে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে কি অবস্থান নিয়েছিল দেখা যাক। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে এস.ইউ.সি একটা প্রচার পত্র প্রকাশ করে তাতে তারা লিখছেন "অন্যদিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে 'শান্তি হচ্ছে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে, মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থে দেশে গরীব চাষী -খেতমজুরদের অবাধে উৎখাত করিয়ে কৃষি জমির দখল নেওয়া। তারা চায় এ ব্যাপারে কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যাতে না হয়। আর কিছু বিক্ষোভ দেখা দিলেও তাদের বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, বিজেপি, সি.পি.এম., তৃণমূল এরকম যারা যেখানে অপজিশনে আছে তারা যেন সেই বিক্ষোভের নেতৃত্বে থাকে, যাতে বিপ্লবী দল আন্দোলনের নেতৃত্বে না আসতে পারে এবং আন্দোলন বেশি দূর না গড়ায় ও স্থায়ী না হয়। ঐ প্রচার পত্রেই তারা লেখে, 'তাই এস.ইউ.সি.আই. সম্পর্কে দেশি বিদেশি পুঁজিপতিরা কংগ্রেস, সি.পি.এম, তৃণমূল, বিজেপি সকলেই অত্যন্ত আতংকিত।' ১ বছরের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে দুরকম কথা বললো এস.ইউ.সি। প্রথমে বললো তৃণমূলকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দল, পরে বললো গণআন্দোলনের শক্তি। আসলে গত পঞ্চায়েতে সিট বাড়ানো কিংবা সংসদে একজন সদস্য পাবার জন্য তারা মূল্যায়ন পাল্টে ফেললো। এই মূল্যায়ন নীতিকে প্রতিষ্ঠা করেনা। এখানে আশু স্বার্থের জন্য নীতিহীনতা প্রকট ভাবে ধরা পড়ে। একটি বিকল্প সংগ্রামী বাম শক্তির একটা সুনির্দিষ্ট ধারা নিয়ে এরাজ্যে প্রতিষ্ঠা না পাবার অন্যতম কারণ হলো এই নীতিহীনতা বা দিশাহীনতা। সুতরাং আজ শাসকদের জোটের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াইয়ের প্রকৃত নীতিভিত্তিক জোট গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগ গড়ে তোলা জরুরী হয়ে পড়েছে। শুধু যে জোট নির্বাচনী জোট হবেনা বিশ্বায়ন বিরোধী প্রতিবাদী লড়াইয়ের এক বিকল্প জোট হবে। শাসকদের রাজনৈতিক জোটের বৃত্তের বাইরে যে জোট এ রাজ্যের প্রতিবাদের সমস্ত লড়াইকে এক নতুন সূত্রে বাঁধবে এবং গণ আন্দোলনকে জোরদার করবে।

পেট্রোকেমিক্যাল হাবে কর্মসংস্থান

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ল্যাজে গোবরে হবার পর সি.পি.আই. (এম) দলের নতুন অস্ত্র নয়াচরে কেমিক্যাল হাব। এই প্রকল্প হলে নাকি কয়েক লক্ষাধিক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে। নয়াচরের কেমিক্যাল হাব নিয়ে আমাদের বক্তব্য এখানে রাখবোনা। যদি কেমিক্যাল হাব হয় তাহলে কত কর্মসংস্থান হবে? আসুন আমরা দেখি, রাসায়নিক শিল্প, বিশেষত বিপুলমাত্রিক পেট্রোরাসায়নিক শিল্প — যেখানে ইথিলিন, প্রপিলিন, বেঞ্জিন প্রভৃতি হয় — সেগুলি প্রধানত উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চ মূলধন বিশিষ্ট। এখানে দ্রব্য বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়, দ্রব্যমান বজায় রাখা, ব্যয়সংকোচ করা বা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ এবং সেই জন্য স্বয়ংক্রিয় এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হয়, শ্রমিকের প্রয়োজন কম।

এই ধরনের যন্ত্র পরিচালনার জন্য স্বল্প-সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কাজেই কর্মসংস্থানের পক্ষে এই ধরনের শিল্পের উপযোগিতা অল্প।

দুটি উদাহরণ দেখা যাক।

২০০৭ সালের আগস্ট মাসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেটিসি কর্পোরেশন, জুরং দ্বীপ প্রকল্প রূপায়ণের ভারপ্রাপ্ত সংস্থা, জানিয়েছে যে তখন পর্যন্ত জুরং দ্বীপে ৯০টি পেট্রোকেমিক্যালস সংস্থা মোট বিনিয়োগ করেছে ২৭০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং এর ফলে কর্মসংস্থান হয়েছে ১২০০০। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের হার সাড়ে বাইশ লক্ষ মার্কিন ডলার বা (বর্তমান বিনিময় হারে) এগারো কোটি টাকা পিছু একজন।

এবারে হলদিয়া পেট্রোরাসায়নিক কারখানা দেখা যাক। এখানে বিনিয়োগ প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা, কর্মীসংখ্যা ৬৭০। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে প্রতি নয় কোটি টাকায় একজন।

কর্মসংস্থান অবশ্য শুধু পেট্রোরাসায়নিকের প্রত্যক্ষ কর্মীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সংযুক্ত অন্যান্য কর্ম, অনুসারী শিল্প ইত্যাদিতেও কিছু কর্মসংস্থান নিশ্চয় হয়। কত হয় দেখা যাক।

পিপল্‌স ডেমোক্রেসিতে পাই হলদিয়া প্রকল্পে অনুসারী শিল্প হয়েছে ৪১১, কর্মসংস্থান প্রত্যক্ষ ১১০৫৫, অপ্রত্যক্ষ আনুমানিক ১২০০০। অর্থাৎ পুরো হলদিয়া প্রকল্পে কর্মসংস্থান পঁচিশ হাজারের কম — প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, সমস্ত কিছু ধরে।

রাজ্য অর্থমন্ত্রী ২০০৫-০৬ সালের অর্থবন্টন পরিকল্পনা বক্তৃতায় জানাচ্ছেন যে হলদিয়া পেট্রোরসায়ন প্রকল্পে অনুসারী শিল্প হয়েছে ৬৪৮টি; এর মধ্যে ৬২৭টি পশ্চিমবঙ্গে এবং এইগুলির ৫৭টি মধ্যবিনিয়োগী এবং ৫৬৫টি স্বল্পবিনিয়োগী বা ক্ষুদ্র শিল্প (৫৭ ও ৫৬৫ যোগ করলে হয় ৬২২; বক্তৃতাতে বাকি ৫টির হিসাব দেওয়া নেই।) এইগুলিতে কর্মসংস্থান কত তার সরাসরি কোনো উল্লেখ নেই। তবে ঐ বক্তৃতায় পরের অংশে পাচ্ছি যে ১৯৯৪-৯৫ সালে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ছিল ১৯.১ লক্ষ ও কর্মসংস্থান ছিল ৪৩.৮ লক্ষ অর্থাৎ শিল্প পিছু ২.৩ জনের মতো। ২০০০-০১ সালে এইগুলি বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ২৭.৭ লক্ষ ও ৫৮.৭ লক্ষ, অর্থাৎ শিল্প পিছু ২.১ জনের মতো। যদি আমরা ধরে নিই যে পেট্রোরসায়নের অনুসারী শিল্পে — ক্ষুদ্র শিল্পে গড়ে তিন জনের এবং মধ্যবিনিয়োগী শিল্পে এর প্রায় দশ গুণ বা গড়ে ৩০ জনের কর্মসংস্থান হচ্ছে, তবে উপরোক্ত ৫৭টি মধ্যবিনিয়োগী এবং ৫৬৫টি স্বল্পবিনিয়োগী বা ক্ষুদ্র শিল্পে মোট কর্মসংস্থান মোটামুটি তিন হাজার চারশোর মতো। তা হবে বর্তমানে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস থেকে সরাসরি ও পরোক্ষে মোটামুটিভাবে ৬৭০+ ৩৪০০= ৪০৭০ চাকরির সম্ভাবনা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোকেমিক্যাল হাব বা ডব্লিউ-পিসিপিআইআর সংক্রান্ত প্রসার শুরু হলে কী দাঁড়াবে?

ক্যালস কোম্পানি যে শোধনাগার তৈরি করবে, সেখানে প্রথম পর্যায়ে ৫৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ৫০ লক্ষ টন শোধনক্ষমতা বসবে, সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে ১৫০০ জনের; ২৩,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ তিন পর্যায় মিলিয়ে ২ কোটি টন শোধনক্ষমতা বসবে, সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৬ থেকে ৮ হাজার।

হলদিয়ার বর্তমানে যে শোধনাগার আছে সেটি আইওসি কোম্পানির। তার শোধনক্ষমতা বছরে ৬০ লক্ষ টন। আইওসি তাদের পেট্রোরাসায়নিক কেন্দ্রে ১.৫ কোটি টন ক্ষমতার নতুন একটি শোধনাগার করার ও তাদের পুরানো শোধনাগারের ক্ষমতা ১৫ লক্ষ টন বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছে। এই হিসেব যদি ঠিক হয় তবে ঐ কেন্দ্রে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা যোগ হবে ১.৬৫ কোটি। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কত বাড়বে? এক্ষেত্রে উপরে বলা ক্যালস-এর শোধনাগারের হারে কর্মসংস্থান ধরাই যুক্তিযুক্ত। সেই হিসেবে আইওসি'র শোধনাগারে ৫ থেকে ৭ হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে।

এইচপিএল ৫৩০০ কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগ করবে, পুরানো উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ শতাংশ বাড়াবে। নতুন বিনিয়োগ না কি ৫০ হাজার নতুন চাকরি আনবে। নতুন প্রযুক্তির নিয়ম, বিনিয়োগের একক পিছু কর্মসংস্থান কমবে। কিন্তু আগের হার (৬০০০ কোটিতে ৪০৭০ চাকরি) ধরলেও সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তিন হাজার ছশোর মতো বাড়বে পুরানো ক্ষমতা বাড়ায় চাকরি বাড়বে ১২২১ টি, সব মিলিয়ে ৫ হাজারের কম।

(সূত্র - নয়াচর ও কেমিক্যাল হাব: এক পর্যালোচনা)

Declaration No. 178/04; 18.11.04

পাঁচ বছরের এনডিএ জমানাকে বিজেপি বলেছিল

অভুক্ত পেট...
দেনাগ্রস্ত চাষী.....
সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু ....
সেদিন টের পেয়েছিল
উদয়ের মানে কতটা অন্ধকার!
ইন্ডিয়া শাইনিং-এর নামে গনগনে আঁচে
ঝলসে নিলে কেমন লাগে আমাদের মাতৃভূমিকে!

তারপর আবার

ভোট ! ভোট !! ভোট!!!

ক্ষমতায় এলো কংগ্রেস
তথা ইউপিএ

সমর্থনে

এবং দেশ বিক্রীর
ফেরিওয়ালাদের এই
পাঁচটা বছর আরো একবার মনে করিয়ে দিয়ে গেল

রাজা আসে যায়/আসে আর যায়/এই রাজা আসে ঐ রাজা যায়
শুধু কাপড়ের রঙ বদলায়/শুধু পোশাকের ঢঙ বদলায়

দিন বদলায় না

দেশকে বেচে দেওয়ার রাজসূয় যজ্ঞে গত ৫ বছরের ইউপিএ জমানায় যোগ হল—

- সেজ আইন '০৫
- বীজ বিল '০৪
- জাতীয় কৃষকনীতি '০৬
- ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি
- সন্ত্রাসবিরোধী কালা কানুন
- খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগ
- উৎপাদন ও পরিষেবায় অবাধ বিদেশী লগ্নি সহ অসংখ্য পদক্ষেপ

SEZ (বিশেষ আর্থিক অঞ্চল) আইন '০৫

দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের শোষণের নয়া উপনিবেশ বানানোর স্বার্থে ২০০৫ সালে কংগ্রেস যখন এস ই জেড আইন তৈরী করলো, তাতে সমর্থন জানালো

বিজেপি-সিপিএম-তৃণমূল কংগ্রেস সহ প্রতিষ্ঠিত দলগুলো !

আর এই আইনের মানে দাঁড়ালো—

১। SEZ ভারতের সীমার মধ্যে এমন এক অঞ্চল যেখানে ভারতের আইন না মানাটাই হবে সাধারণ আইন।

২। SEZ নির্মাতা ও উৎপাদক সংস্থা প্রায় সমস্ত রকম করের হাত থেকে রেহাই পাবে। ঘটবে বিপুল রাজস্ব ঘাটতি। ফলে ব্যাপকভাবে কমে যাবে সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ।

৩। SEZ নির্মাতা কোনো শুল্ক ও কর না দিয়ে অবাধে প্রোমোটারি ব্যবসা করতে পারবে।

৪। দেশের চালু শ্রম আইন মানার বিষয়টি প্রায় নস্যাৎ করে দেওয়া হল। কেড়ে নেওয়া হল প্রতিবাদের ন্যূনতম অধিকারগুলিও।

৫। SEZ স্থাপনের মাধ্যমে চালু হল কর্পোরেট জমিদারি।

৬। SEZ স্থাপনের ফলে যত কর্মসংস্থান হল, তার অনেক গুণ বেশি মানুষ জীবিকা হারাতে শুরু করল। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ জনতা হারাতে শুরু করেছে তাদের পেশা ও আশ্রয়।

৭। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা আরও খারাপ চেহারা নিচ্ছে। খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠছে। দেশি-বিদেশি বহুজাতিকগুলির অবাধ মুনাফা সৃষ্টির ক্ষেত্র হয়ে উঠছে দেশের কৃষিক্ষেত্র।

গত ৪ বছরে ২৫০টির বেশি SEZ প্রকল্প সবুজ সংকেত পেয়ে গেছে। ৭৭টি SEZ-এর জন্য অধিগৃহীত জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার হেক্টর। কংগ্রেস সরকারেরই অর্থমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী তৈরি হওয়া SEZ গুলিতে কর, সেস ও শুল্ক ছাড়ের কারণে সরকারি কোষাগারে ক্ষতি হবে ৩৮০০ কোটি ডলার বা ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। এই টাকায় দেশের ৩০ কোটি লোকের খাবার ব্যবস্থা করা যেত বা প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার থেকে অন্তত একজন সদস্যের চাকরি হতে পারত। দেশজোড়া SEZ প্রকল্পগুলির ফলে অন্তত ১০ লাখ লোক জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। আরও ১ লক্ষ ২৫ হাজার হেক্টর জমি কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছে কংগ্রেস।

এসেছে

দ্য সীড (বীজ) বিল '০৪ এবং জাতীয় কৃষক নীতি ২০০৬

কপাল পুড়লো কৃষকদের

প্রস্তাবিত বীজ আইনে বলা হল

- নিজেদের সংগ্রহের নয়, ব্যবহার করতে হবে শিল্পসংস্থার বীজ।
- বাড়াতে হবে বীজের আমদানী।
- কৃষক বীজ তৈরী করলে নথিভুক্ত করাতে হবে। না হলে তাকে জেলে পোরা হবে।
- বীজের মান কয়েকটা নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উতরোতে না পারলে চাষী বীজ বিনিময় বা বিক্রী করতে পারবেন না।
- ধানবীজ থেকে মুড়ি বানাতে গেলেও তা নথিভুক্ত করাতে হবে।

অর্থাৎ, বীজ বানানোর অধিকারটুকুও গরীব চাষীর থেকে কেড়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হবে দেশি-বিদেশী কর্তারিকের হাতে। আমাদের দেশের নিজস্ব জাতগুলো, পদ্ধতিগুলো বাঁধা পড়ে যাবে বহুজাতিকদের হাতে।

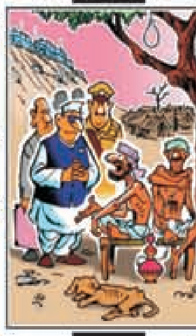

চিরসবুজ বিপ্লবের তত্ত্ব

সবুজ বিপ্লব নিয়ে স্বীকারোক্তি

- ভুল সবুজ বিপ্লবে : সবুজ বিপ্লবের প্রণেতা এম. এস.স্বামীনাথন
- উপাদানের ভুল ব্যবহার হয়েছে, তার ফলে কমেছে উৎপাদন দক্ষতা।
- ক্ষতি হয়েছে পরিবেশ ও অর্থনীতিরও।
- আমেরিকার সাথে চুক্তি : কৃষিবিজ্ঞান চর্চায় মার্কিন অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পরিচালনমণ্ডলীতে মনসান্টো ও ওয়ালমার্ট
- চিরসবুজ বিপ্লবের এই চর্চা হবে বাজারের চাহিদামাফিক

মনসান্টো, কার্গিল, বায়ার প্রভৃতি কোম্পানীরা এই দুই নীতির জোরে কৃষকদের সর্বনাশ করবে, কৃষি ব্যবস্থাকে শোষণের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করবে। দেড় লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল আমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছি। এ মিছিল বেড়েই চলবে?

শ্রমজীবী জনগণের ওপর এরকম আক্রমণ নেমে এল একের পর এক।

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ
শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ঢালাও বেসরকারীকরণ
ব্যাঙ্ক, বীমা, শেয়ার মার্কেটে ঢালাও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ,
শস্যের দামের প্রবল অস্থিরতা,
কৃষি উপকরণের খরচ বৃদ্ধি,
ভর্তুকি ছাটাই,
সরকারী-বেসরকারী শিল্পে নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ
জাতীয় গ্রামীণ নিশ্চয়তা প্রকল্পের প্রহসন,
লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি

এসবই দেখেছে বিজেপি-'বামেরা'... নিশ্চুপে...

অবশেষে এল ভারত-মার্কিন পরমানু চুক্তি প্রসঙ্গ

আর আমরা দেখলাম সিপিএমকে—
যারা হরিপুরে পরমাণু চুল্লীর প্রবক্তা,
যারা মার্কিন সংস্থা ম্যাকিনসের পরামর্শে
কৃষি-শিল্পনীতি রচনা করছে,
যাদের সাথে আজকাল হেনরি কিসিঙ্গারের মত মার্কিন যুদ্ধবাজদের নিত্য ওঠাবসা
তারাই নেমেছে পরমাণু বিদ্যুৎ আর সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরোধিতায়!

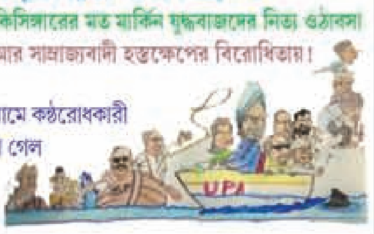

সন্ত্রাসদমনের জোড়া আইনের নামে কণ্ঠরোধকারী
ভয়াবহ কালাকানুন নিয়েও দেখা গেল
সব সংসদীয় দলের সায়।
সব শেয়ালের এক রা।

ভোট আসে ভোট যায়। শ্রমজীবী মানুষের জীবন বদলায় না। এ কাহিনী নতুন কাহিনী নয়। একই কথার পুনরাবৃত্তি, নানা রঙে কেবল।

সমাজের, অর্থনীতির আমূল বা বলা যায় বৈপ্লবিক বদল না হলে শুধু মাত্র ভোটের মাধ্যমে চালু ব্যবস্থার ভিতরে সরকার বদল দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হওয়ার নয়—একথাটা সংগ্রামে ব্রতী আরো বহু মানুষ ও সংগঠনের মত আমরাও বলি।

এই পাতাটায় তাই একটা ফিরে দেখা—বিগত পাঁচ বছরের পাতায়, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর হাত ধরে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা, আমাদের দেশ। আবার একটা ভোট... আবার একটা সরকার... চক্রব্যূহ থেকে বেরোতে প্রয়োজন শ্রমজীবী মানুষের প্রতিরোধ, সমাজে সংখ্যাগুরু মেহনতী মানুষের স্বার্থে একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আর এই মালিকী রাজের অবসান।

ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গাত্রে হল ব্যথা!

কংগ্রেসের সাথে এখন নরমে গরমে
বিজেপির সাথে যুযুধান
ঐতিহাসিক ভুল আর হবে না বলে
এখন তৃতীয় ফ্রন্টের ঢাক পেটাচ্ছে সিপিএম!
কিন্তু কাদের নিয়ে এই তৃতীয় ফ্রন্ট?

দুর্নীতিগ্রস্ত জয়ললিতা,
ক্ষমতালোভী মায়াবতী,
গরীব নিধনকারী
চন্দ্রবাবু, নবীন পট্টনায়েক...

আর আমরাই বা ভুলি কি করে
সেই দৃশ্যটা?

এসব বিকল্পের গল্প শোনাতে শোনাতেই তো
হাতে হাত ধরে সভা করেছিলেন
জ্যোতিবাবুরা ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক বিজেপির সাথে।

আর নীতির কথা? শাসকশ্রেণীর নীতি রূপায়নে

ডান-বাম-রাম সব এক হ্যায়

খাম্মাম-কলিঙ্গনগর-নন্দীগ্রাম
আরো একবার তা মনে করিয়ে দিয়েছে।

অঙ্গরাজ্যে সরকার গড়ে মেহনতী জনতাকে রিলিফ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা গদীর মোহে '৬০-এর দশকের ঐতিহাসিক লড়াইকে পরিত্যাগ করেছিল, তাদের স্বরূপ চিনতে এরাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের অনেক বছর চলে গেল।
'৭৭ থেকে '৯১-'৯২ তবু কিছু রাখঢাক ছিল
'৯৪-এ এল নয়া শিল্পনীতি-কৃষিনীতি

সারি লম্বা হল বন্ধ কারখানার, দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতর হল কৃষকের!

তারপর গত ১০ বছরে ক্রমশই বেড়েছে সিপিএমের দক্ষিণায়ন। আর এখন তো

পুঁজিবাদের সাথে রক অ্যান্ড রোল একদম খুল্লাম খুল্লা

"স্ট্র্যাটেজির প্রধান ধাক্কাটি হল সংস্কারপন্থী নেতৃত্বকারী রাজ্যগুলিকে তাদের কর্মসূচীতে সমর্থন করা, যাতে এটা দৃষ্টান্তমূলক প্রভাব তৈরী করে অন্য রাজ্যগুলিকে সংস্কারের পথ গ্রহন করতে... যারা স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের কাজে ঢিলা দিয়েছে বা বন্ধ করেছে, তাদের তৎক্ষনাৎ ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

Left is Right

"We, Marxists are not fools to stick to obsolete ideas. The Left in Bengal is right. Invest in state and witness the changing face of Marxist Bengal."

Buddhadeb Bhattacharya, CII Summit, 2005

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নির্দেশ
অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে
নেমে পড়লো
মরিচঝাঁপি-মুলুক-নানুর-ছোট আঙারিয়া
-এর হত্যাকারীরা;
আর একটা গণহত্যা দেখলাম আমরা—

নন্দীগ্রামে

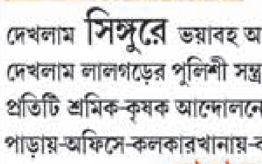

দেখলাম **সিঙ্গুরে** ভয়াবহ আগ্রাসী চেহারা
দেখলাম লালগড়ের পুলিশী সন্ত্রাস।
প্রতিটি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে দলীয় ও পুলিশী সন্ত্রাস আর পাড়ায়-অফিসে-কলকারখানায়-কলেজে খবরদারি সইতে সইতে আসা মানুষ এবার ধরলেন **গণআন্দোলনের রাস্তা**

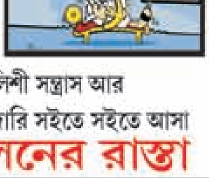

আবার মানুষ প্রশ্ন করছে,

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ছে মানুষ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

ন্যানো নিয়ে মায়াকান্না ঢাকতে পারেনি

হাজার হাজার বন্ধ কারখানার হাহাকারকে।

কর্মসংস্থানের ঢক্কানিনাদের আড়াল থেকে বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে

কর্মচ্যুত শ্রমিক, কর্মহীন কৃষক আর বেকার যুবর কান্না।

খাদ্য আন্দোলনের শহীদ নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইতদের স্বপ্ন যতই চাপা দিতে চাক ওরা

সিঙ্গুরে তাপসী, নন্দীগ্রামে সেলিমরা আবার জন্ম নিয়েছে।

স্বপ্ন দেখার সাহস কর। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে নাকি?

শ্রমজীবী জনতার মুক্তির রাস্তায়
আসুন, শপথ নিই—এই মালিকী রাজের অবসানের!
মালিকদের পায়ে সংগ্রামের লাল ঝান্ডা বিকিয়ে দিয়ে
এখন শ্রমজীবী নিধনে নেমেছে ঝুটা 'বামপন্থীরা';

আর তৃণমূল কংগ্রেস?

জাতীয় কংগ্রেস এসইজেড আইন
তৈরী করলো, আর নন্দীগ্রামে
সেই এসইজেড-এর বিরোধিতা
করলো যে তৃণমূল কংগ্রেস,
তারাই হাত মেলালো

কংগ্রেস এর সাথে!

তারা সমর্থন জানাচ্ছে
শালবনীর এসইজেড তৈরীতে!!
শ্রমিকের পাশে নয়,
হিন্দমোটর্সে, ডানলপে তারা পাশে দাঁড়াচ্ছে মালিকদের।
গণআন্দোলনের প্রতি এই বিশ্বাসভঙ্গগুলোকেও নজরে রাখুন।
সময়ে সময়ে শাসকশ্রেণীর অন্যতম প্রধান দুই দল কংগ্রেস বা বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণের এই সুবিধাবাদকে বিরোধিতা করুন। গড়ে তুলুন সাচ্চা সংগ্রাম, শ্রমজীবী জনতার বাঁচার স্বার্থে।

সত্ত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : অমৃত পৈড়া